Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.26-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈষ্ণব পদাবলী: শাশ্বত প্রেম কাব্যের অপূর্ব বাণী রূপ

সুধাংশু দত্ত
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Just as there is spirituality in Radha-Krishna love in Vaishnava terms, there are various forms of human nature love. For this reason, Rabindranath asked the Vaishnava poets - "Tell me, O Vaishnava poets, where did you get this image of love." Rabindranath felt that without the experience of real love, such an extraordinary portrayal of eternal love is not possible. Through this we can uncover the essence of Vaishnava poetry.
Keywords: শাশ্বত, রসাত্মক বাক্য, আনন্দ সৃজন, অবগাহন, ধর্মীয় সংস্কার, প্রেম তৃষ্ণা, গোষ্ঠী চেতনা, কাব্য কৌশল, ধর্মনিরপেক্ষ আবেদন, সুখ-দুঃখবিরহমিলনপূর্ণজীবন,আত্মগোপন, রঞ্জন রশ্মি।

বৈষ্ণব পদাবলী শব্দটির মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্মের ছায়াপাতের ইসারা আছে। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মের নিরিখে রচিত তাই বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলী যে বিশেষ একটি ধর্মীয় চেতনার স্বচ্ছ আলোকে রচিত, তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় বৈষ্ণব ধর্মের স্বরুপ উদঘাটন নয়। বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা,আমাদের তাই আলোচ্য। এই আলোচনার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে কাব্যের যথার্থ সংজ্ঞা কি।

আমরা মোটামুটি এটাই জানি যে, কাব্য হলো রসাত্মক বাক্য। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন রস যুক্ত বাক্যই কাব্য অর্থাৎ সেই বাক্যই কাব্য রস যার আত্মা। আত্মা না থাকলেও যেমন দেহের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি রস না থাকলে কোনো বাক্য কাব্য হয়ে উঠতে বাধা পায়। রস কী - এই কথার উত্তরে বলতে হয়, মানব দেহের আত্মার যেমন ব্যাখ্যা চলে না, তেমনি রসেরও ব্যাখ্যা নেই। তবে রসের উপলব্ধি আছে। বাক্যের দুটি অংশ।একটি শব্দার্থ অপরটি ব্যঙ্গার্থ। যে বাক্যের সমস্ত অর্থই শব্দার্থে নিঃশেষিত না হয়ে বিষয়ান্তরের দ্যোতনা সৃষ্টি করে তাহলে সেটিই যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করে। এই বিষয়ান্তরের দ্যোতনা সৃষ্টির অপর নাম ধ্বনি। এই ধ্বনিই রসের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। ইংরেজিতে এই ধ্বনিকে বলা হয় Suggested Sense। এটা বলা যেতে পারে যে, যথার্থ কাব্য হতে গেলে বাক্যের একটি বিশিষ্ঠ গুন থাকা চাই। সেই গুণটি হলো ধ্বনি দ্যোতনা। যে বাক্য এই ধ্বনি দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে তাতে আর যত উপাদানেরই মিশ্রণ থাকুক না কেন তা কাব্য। আমরা এখানে বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব ধর্মের মিশ্রণের কথাই বলছিবৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব সংস্কার থেকে গেছে তার রচনাকালীন আদর্শের জন্য। সাধারণত কাব্য রচনার জন্য চাই একটি বিশেষ মুহূর্ত। ইংরেজিতে এই বিশেষ মুহূর্তের নাম দেওয়া

যেতে পারে Inspired Moment। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার পূর্ব মুহূর্তে এই Inspired Moment এর সৃষ্টি হয়েছিল কিনা আমরা দেখব এবং এই Moment এর স্বরুপ উপলব্ধি করলে আমাদের উদ্দশ্য সিদ্ধ হবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য উপজীব্য কী, যদি কেউ এই প্রশ্ন করেন, তবে বলতে হয় রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা - কীর্তন। এই লীলা কীর্তনের মধ্যেই বৈষ্ণবীয় সংস্কার নিহিত রয়েছে। পাঠক কোনভাবেই এই সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেন না। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে কোন ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদনে সাড়া দিতে অপারগ হন। কিন্তু কাব্য পাঠকালে পাঠকের মনে যদি কোন প্রকারের সংস্কার জাগরুক থাকে, তবে কাব্যপাঠের যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অতএব আমাদের জেনে রাখা উচিত কাব্যের উদ্দেশ্য কী?

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কাব্যের উদেশ্য আনন্দ সৃজন। কাব্যের ধ্বনি যে রসের উৎস সন্ধানে টেনে নিয়ে যায়, তা ওই আনন্দের সুধা ভান্ডারের চাবি পাবার জন্য। এই সোনার চাবির সন্ধান যে পাঠক পান তার মন যে সংস্কারমুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর যে ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদনের কথা বলেছিলাম সে আবেদন হলো রসের আবেদন। এই রস কাব্যের। কাব্যগত রসের সমুদ্রে অবগাহন করতে হলে, পাঠককে যেকোনো প্রকারের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে।

বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করতে গেলে যেমন পাঠক বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ ভুলতে পারেন না, তেমনি বৈষ্ণব পদকর্তারা যখন এই পদগুলি রচনা করতেন, তখন তারাও উক্ত ধর্মীয় চেতনা সামনে রেখেছিলেন। চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে ওই ধর্মীয় সংস্কার বড় বেশি পরিমাণে প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই সংস্কার প্রবর্তনে গোস্বামীদের শাস্ত্রীয় নির্দেশকেও লঙ্ঘন করতে পারেন নি। উক্ত নির্দেশের বিধানগুলি লঙ্ঘিত হলে মহাপাতক হবে, এমন সশঙ্ক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল পদকর্তা এবং পাঠকের মনে। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার দিন অবসিত হলেও তাতে পাঠকের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বরং বলতে পারা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী এখনও নূতন চেতনায় নব নব ভাবের সমুদ্র সম্ভাবনায় পঠিত হচ্ছে। অতএব ভেবে দেখতে হবে বৈষ্ণব পদাবলীতে সত্যই কোন ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদন আছে কিনা। এই জিজ্ঞাসা আধুনিককালের। আধুনিক মন কাব্যের যথার্থ সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য রেখে কাব্য পাঠ করে। এখন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করতে গেলে পাঠককে আধুনিক মনের অধিকারী হতে হবে।

অনেকে আবার বলেছেন, বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবীয় আদলে লিখিত হলেও তা গীতি কবিতা। গীতি কবিতার যত বৈশিষ্ট্যই থাক তা যে গীতি কবির ব্যাক্তিগত মনের প্রকাশ মাত্র তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীতেও তেমনি পদকর্তাদের ব্যক্তিক প্রকাশ হয়েছে।
এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> ‘সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু - আঁখি পড়েছিল মনে?’
> (বৈষ্ণব কবিতা সোনারতরী)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান নয়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান - অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন, বৃন্দাবন গাথা - শ্রাবণের শর্বরীতে কদম্বের তলে বসে প্রণয় স্বপণে চারচক্ষে এই যে চেয়ে দেখা, তা শুধু দেবতার নয়। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেম তৃষ্ণা দীন মর্ত্যবাসী নর নারীদের প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের প্রেম তৃষ্ণারই অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, বৈষ্ণব পদকর্তাদের নিজ নিজ জীবনের প্রেম - লীলার রসরুপ ঐ বৈষ্ণব পদাবলী। তাঁর মতে বৈষ্ণব পদাবলী গীতি কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলী গীতি কবিতা কিনা, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে এটাই বলতে হবে, বৈষ্ণব পদাবলী রচনার পূর্ব মুহূর্তে বৈষ্ণব কবিরা যতই অতনু দেবতার পঞ্চশরে দগ্ধ হোন না কেন, তাঁরা বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠী চেতনাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকাশমান গোষ্ঠী চেতনাকে অস্বীকার করা যায় না। গোষ্ঠী চেতনাকে বৈষ্ণব পদকার্তারা আমল দিলেও আমরা দিতে চাই না। আমাদের বলতে ইচ্ছা করে বৈষ্ণব পদকর্তারা সুচতুর ছিলেন মনে হয়। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের কাব্যাবেগ ওই বৈষ্ণবীয় ভাবের সংকীর্ণ প্রাঙ্গণেও অতিলৌকিক ভাবে বাঙ্ময়রূপে প্রকাশ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করতে করতে ওই চাতুর্যের কথা বারবার মনে পড়ে। ওই চাতুর্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বৈষ্ণব কবিদের অপূর্ব কাব্য কৌশল। পাঠক হিসেবে আমাদের ওই কাব্য কৌশলকে বারবার স্মরণ রাখতে হবে।

বৈষ্ণব পদাবলী যে নিঃসন্দেহে ধর্মীয় সাহিত্য, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ধর্মীয় সাহিত্যের মতো সাহিত্য আরও বহু বিষয়কে আশ্রয় করতে পারে। অর্থাৎ কোন বিশেষ একটি তত্ত্ব বা তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। আমরা যদি দেখি দার্শনিক ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় সাহিত্য, যথার্থ সাহিত্য পদ বাচ্য হয়েছে। তবে তা পাঠকের হৃদয় তৃপ্তির কারণ হবে। বস্তুত ধর্মীয় সাহিত্য হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী অপূর্ব। কেননা, পাঠক তা পাঠ করে অপার্থিব আনন্দ লাভ করে। এই পাঠক শ্রেণীতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ রয়েছে। বাংলা দেশের মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম এবং মতানুসারী হয়েও বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে। এই অশ্রু বিসর্জনের মধ্যে লুকিয়ে আছে বৈষ্ণব পদাবলীর ধর্ম নিরপেক্ষ পার্থিব প্রেমের আবেদন। অতএব সর্বশেষ সিদ্ধান্তে বলা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল একটি বিশিষ্ঠ যুগের বিশিষ্ঠ মতের অনুসরণে। কিন্তু সে যুগ পেরিয়ে গেছে। সেই বিশিষ্ঠ মতও আজ বিশেষ মর্যাদা পায় না। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী যুগান্তরের পটভূমিকায় পাঠকের সামনে সপ্রশ্ন কৌতুহল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। - ’ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’ (বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা জানি, সাহিত্য জীবনেরই সমালোচনা। এই জীবন মর্ত্যের জীবন। সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ এই মর্ত্য জীবন সাহিত্যে অমর্ত্য ও বাঙ্ময় রূপ পেয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে আমরা জানতে পারি, এতে এই মর্ত্য জীবনেরই রসভাষ্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা পুনরায় রবীন্দ্রনাথের ‘বৈষ্ণব কবিতা’ - র সঙ্গত উল্লেখ করতে পারি। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মর্ত্য জীবনের প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভাবটি হোল ‘রতি’। রতি এই মূল ভাবটি থেকে উৎসারিত হয়েছে শৃঙ্গার রস। প্রেমের প্রথম ভাগে যেমন পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ থাকে, বৈষ্ণব পদাবলীতেও তেমনি প্রেমের রসপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব প্রেমের উত্তেজনা, শিহরণ, উত্তাপ বৈষ্ণব পদাবলীতে অপার্থিব পাত্রে পরিবেশিত হয়ে অপূর্বতা লাভ করেছে। রাধা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোরা। প্রথম দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভালোবেসে মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন। তাঁর পক্ষেই তো বলা সম্ভব,-

‘না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।’

(দ্বিজ চণ্ডী দাস) অতএব কৃষ্ণকে পাবার চিন্তায় রাধার মন প্রাণ আনচান করে উঠছে।

কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা রাধা। আর এই প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠায় তিনি বলতে বাধ্য হন, -

‘সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সই পিরিতি অনুরাগ রাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।। (কবি বল্লভ)

কিন্তু তিলে তিলে নূতন হয়ে এমন কি লাভ, যদি না কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে। অতএব গৃহের দ্বার রাধিকাকে উন্মুক্ত করতেই হবে। ছুটে যেতে হবে কৃষ্ণ সন্নিধানে। সত্যিই একদিন রাধিকাকে অতি সন্তর্পনে সবার অলক্ষ্যে সংকেত কুঞ্জে যেতে হোল। কৃষ্ণ সান্নিধ্যে গিয়ে রাধিকা এই বলে মনের সাধ মেটালেন, -

‘তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চির দুঃখ অব দূরে গেল।।’ (গোবিন্দ দাস)

কিন্তু রাধিকার দুঃখ কি দূর হবার? কারণ, তিনি জানতে পেরেছেন শ্রীকৃষ্ণ রাধা প্রেমে ততখানি আসক্ত নন। কেমন যেন উদাসীন রাধার অন্তরে জাগে আক্ষেপ। তিনি বলেন –

‘কি মোহিনী জান বধূ।
কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে তোমা নাহি হেন।।’ (দ্বিজ চণ্ডী দাস)

এই কৃষ্ণ প্রেমের জন্যই কিনা রাধিকা ঘরকে বাহির বাহিরকে ঘর করেছেন; পরকে আপন, আপনকে পর করেছেন এবং রাতকে দিন, দিনকে রাত করেছেন। তবুও কৃষ্ণ ‘পিরীতি’ বুঝতে পারলেন না। রাধিকা আত্ম দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে বলেন –

‘সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া – সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
(জ্ঞান দাস)

একদিন যে রাধিকা বলেছিলেন –

বধূ, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ

সদা লইয়া রাখি বুকে।।
(জ্ঞান দাস)

সে রাধিকার এখন বিরহ তাপিত দিনগুলি দুঃসহ! রাধার কাছে, -

‘শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি।।
(বিদ্যাপতি)

এই চরম শূন্যতাকে বুকের গভীরে নিয়ে পরম রিক্ততার গাম্ভীর্যে তাকে না বলে উপায় নেই, ‘সে কি কেবলই যাতনাময়?’

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমে যে উৎকণ্ঠা, যে উদ্বেগ, আত্ম বিসর্জন ও আত্ম নিবেদন, সব দিয়েও না পাওয়া এবং এই না পাওয়াকে শিরোধার্য করে নিয়ে মানসিক ব্যাকুলতা, এটি প্রধানতম সম্পদ। এই আশা, আনন্দ উদ্বেলতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক চমৎকার রোমান্টিকতা। যার জন্য বৈষ্ণব পদাবলী একবার পড়ে আশ মেটে না বারবার পড়তে হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে আবৃত্তি করে সেই রোমান্টিক রস - সমুদ্রের অতল গভীরে ডুবে রাধিকার মতো আমরাও বলতে পারি - ‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’

বৈষ্ণব পদাবলী যে কেবল নিপুণ এবং চিরন্তন প্রেমের চিত্রে পূর্ণ তাই নয়, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য রসের অপূর্ব আবেদনে সাড়া দিতে পারে। বাস্তব জগতের মা যেমন সন্তানের জন্য চিন্তা, ভয়, সংশয়ের কাঁটায় আচ্ছন্ন হন, বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদা ও কৃষ্ণের বাৎসল্য প্রেমের মধ্যে তার সন্ধান মিলবে। বন্ধুর জন্য বন্ধুর আত্ম বিসর্জন, উৎকণ্ঠা, এটিও তো বৈষ্ণব পদাবলীর বিশিষ্ঠ বিষয়। প্রভুর জন্য দাসের ভক্তি উপহার সাজানো, এটিও আমরা দেখি বৈষ্ণব পদাবলীতে। তবুও আমরা বলতে পারি, মধুর রসই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপাদান। এই উপাদানের মধ্যে কোন ধর্মীয় সংস্কার নেই।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বৈষ্ণব পদাবলীকে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবনায় পাঠ করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী নিঃসৃত মধুর রসাস্বাদনের মধ্যেই সেই ধর্মীয় নিরপেক্ষতা আত্ম গোপন করে রয়েছে। পাঠক একটু পরিশ্রম করলেই সেই গোপন অজানা রহস্য উদঘাটন করতে পারবেন।

আধুনিক মন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে যে, বৈষ্ণব পদাবলীকে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে পড়া চলবে না কেন? তার কারণ, আধুনিক পাঠক ধর্মীয় সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠেছে। যত দিন যাবে ততই নীতি নির্দিষ্ট ধর্ম চেতনা মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যাবে। অতএব ধর্ম - বিষয়ক কবিতাও তত বেশি পঠিত হবে ধর্ম - নিরপেক্ষ চেতনায়। একদিন ছিল যখন কেউ বৈষ্ণব পদাবলীকে রোমান্টিক প্রেম কবিতা হিসেবে মনে করতো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। বর্তমানে এটি প্রমাণিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন উৎকৃষ্ট কাব্য রসের। উৎকৃষ্ট কাব্য যেমন বিচিত্রভাবে, সুমিত অলংকারের প্রয়োগে, রীতির উজ্জ্বল উপস্থাপনায় ধ্বনিবহুল সুমিষ্ট শব্দ কল্পনায় রসমধুর হয়ে ওঠে, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীও অপূর্ব রসের রঞ্জনরশ্মিতে মায়াময়, মনোময় হয়ে উঠে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে স্থায়ী রসের আবেদন জাগায়।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গোস্বামী সনাতন (স.), বৈষ্ণব পদাবলী, বামাপুস্তকালয়, কলকাতা।
২। গিরি সত্যবতী (স.), বৈষ্ণব পদাবলী, পুস্তকবিপনি, কলকাতা।
৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সোনাতরী, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৪। দাস ক্ষুদিরাম, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে, রত্নাবলী, কলিকাতা।
৬। বসু শংকরী প্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল, কলিকাতা।
৭। মিত্র খগেন্দ্রনাথ (স.), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।